সূচিপত্র

পূর্বাভাস
পর্ব ১ : যা হবার কথা, যা হচ্ছে
১. বিজ্ঞান যেভাবে কাজ করে
২. রেপ্লিকেশন-সংকট
পর্ব ২ : ভুল আর কলঙ্ক
৩. জোচ্চুরি
৪. গোঁড়া
৫. গাফিলতি
৬. হুজুগ
পর্ব ৩ : কারণ ও প্রতিকার
৭. মতলবে ভুল
৮. বিজ্ঞান সংস্কার
৯. শেষ কথা
১০. সংযুক্তি
গবেষণা-পত্র যেভাবে পড়বেন

পূর্বাভাস

৩১ জানুয়ারি, ২০১১। অদ্ভুত এক ঘটনার সাক্ষী হলো পৃথিবী। দুনিয়া জানল অনার্স-পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের অলৌকিক ক্ষমতার কথা।

অনেক নামকরা পত্রিকা সেদিন প্রথম পাতায় বড় বড় হরফে ছাপাল এক বিজ্ঞান গবেষণা-পত্রের খবর। গবেষণা-পত্রটি জানাল প্রায় হাজার খানেকের বেশি লোকজনকে নিয়ে একটা পরীক্ষা করা হয়েছে। পরীক্ষায় দেখা গেছে, এসব লোকজন আশ্চর্যজনকভাবে অজানা খবর বলে দেয়! মানুষের চিরচেনা পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের বাইরে অন্য কিছু একটার ব্যবহার বুঝি তারা জানে। সেটা ব্যবহার করেই তারা ভবিষ্যতের খবরাখবর বলে দিচ্ছে!

আবিষ্কারটা সত্যিই প্রথম পাতায় আসার মতো। তবে গবেষণাটা আরও বেশি নজর কেড়েছে এর গবেষকদের কারণে। গবেষণাটির মূল হর্তাকর্তা ছিলেন কর্নেল ইউনিভার্সিটির মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক ড্যারিল বেম। তার ওপর আবার সেই গবেষণা-পত্রটি ছাপা হয়েছে মূলধারার পিয়ার-রিভিউ-হওয়া মনোবিজ্ঞান জার্নালে। ভবিষ্যতের কথা জানাকে এত দিন বিজ্ঞান অসম্ভব বলেই মানত। কিন্তু এই গবেষণা বিজ্ঞানের পুরাতন সে বিশ্বাসকে একেবারে পালটে দিলো। বিজ্ঞান এখন বিশ্বাস করে, ভবিষ্যৎ জানা সম্ভব।

আমি তখন পিএইচডি স্টুডেন্ট। এডিনবোরা ইউনিভার্সিটিতে সাইকোলজি নিয়ে পড়ছি। খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বেমের গবেষণা-পত্রটা পড়লাম। আপনাদের আমি সেখান থেকে একটা পরীক্ষার কথা বলি।

অনার্স-পড়ুয়া একদল শিক্ষার্থীকে মনিটরের সামনে বসানো হয়েছে। মনিটরে কিছুক্ষণ বাদে দুটো পর্দার ছবি আসবে। তাদের বলা হয়েছে, দুটোর একটার পেছনে আরেকটা ছবি আছে। তাদের এখন আঁচ করতে হবে সেই তৃতীয় ছবিটা কোন পর্দার ছবির পেছনে আছে। যে-পর্দার ছবির পেছনে তৃতীয় ছবিটা থাকবে বলে তারা ধারণা করবে, তারা সেই পর্দার ছবিতে ক্লিক করবে—মানে পুরোটাই আন্দাজে। ক্লিক করার পরই শুধু জানা যাবে কার অনুমান ঠিক।

এই পরীক্ষাটা ওরা ৩৬ বার করলেন।

ফলাফলটা দেখুন কেমন অদ্ভুত। গবেষণা বলছে, পর্দার ছবির পেছনে চেয়ার-টেবিলের মতো ম্যাড়ম্যাড়ে জিনিস থাকলে স্টুডেন্টদের সাফল্যের হার ৫০%। নিখুঁতভাবে বললে, ৪৯.৮%। যেন কোনো কয়েন টস। কিন্তু পেছনে যদি যৌন-উত্তেজক কোনো ছবি থাকে, তখন স্টুডেন্টদের সাফল্যের হার কিন্তু বেড়ে হয়ে যায় ৫৩.১%। সংখ্যাটা পরিসংখ্যানের বিবেচনায় বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটা থ্রেশোল্ড পয়েন্টের ওপরে। থ্রেশোল্ড পয়েন্ট মানে ন্যূনতম যতখানি সম্ভাবনা থাকলে একটা সংখ্যা পরিসংখ্যানের বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

গবেষক বেম শিক্ষার্থীদের এমন অলৌকিক ক্ষমতার কারণ দর্শালেন। তিনি বললেন, মানুষের মধ্যে অবেচতন এক যৌন চাহিদা থাকে। এটাই খুব সম্ভবত একটু করে হলেও স্টুডেন্টদের প্রভাবিত করেছে। যে-কারণে যৌন-উত্তেজক ছবিটা কোন পর্দার ছবির পেছনে আছে সেটা তারা অনুমান করে বলে দিতে পেরেছে।

বেমের এই গবেষণা-পত্রে আরও যেসব পরীক্ষার কথা বলা আছে ওগুলো এত ভেঙে বলা নেই। কিন্তু পরীক্ষাগুলোর যে-বিবরণ তিনি দিয়েছেন, দেখলেই বুঝবেন একেকটা পরীক্ষা কী পরিমাণ হেঁয়ালিতে ভরা।

যেমন আরেকটা পরীক্ষার কথা বলি। মনিটরে এক এক করে মোট ৪০টা শব্দ আসছে। শব্দগুলোর একটার সঙ্গে আরেকটার কোনো সম্পর্ক নেই। ৪০টা

শব্দ আসার পর এখন মেমোরি টেস্ট হবে। স্টুডেন্টরা ৪০টা থেকে কয়টা শব্দ মনে রেখেছে সেগুলো তাদের লিখতে হবে। মনিটরে এখন কম্পিউটার নিজের মতো ২০টা শব্দ বাছাই করে দেখাবে।

পরীক্ষা শেষ।

বেম বলছেন, মনিটর যে ২০টি শব্দ পরে দেখাবে শিক্ষার্থীরা আগেই সেটা বলে দিচ্ছে। অথচ এটা কিন্তু তাদের জানার কথা নয়। তার মতে, এটা অবশ্যই স্টুডেন্টদের অতিলৌকিক কোনো ক্ষমতা।

এই পরীক্ষাটা কী রকম দেখুন। কেউ পরীক্ষার জন্য একরকম প্রস্তুতি নিল। তারপর পরীক্ষা দিলো। পরীক্ষার পর আবার পড়াশোনা করল। যেহেতু সে এখন প্রশ্নপত্র জানে, সে শুধু ওগুলোই পড়ল। তো, স্বাভাবিক—সে যদি আবার পরীক্ষা দিতে পারত, তার এবারের পরীক্ষা অবশ্যই প্রথমবারের পরীক্ষার চেয়ে ভালো হতো। কিন্তু দেখা গেল, দ্বিতীয়বার পরীক্ষা না দিয়েও তার আগের দেওয়া পরীক্ষার রেজাল্ট ভালো হলো! তার মানে, পরীক্ষা দেবার পর সে যে পড়াশোনা করেছে, ওটাই তার ওই পরীক্ষার ফল পালটে দিয়েছে!

এর মানে কী আসলে? পদার্থবিজ্ঞানের সব সূত্র কি ওলট-পালট হয়ে গেল? সময় কি এখন দুদিকে চলে? ফলাফল আগে আসে, কাজ পরে হয়?

বেমের গবেষণার কারণে কিন্তু এসব উদ্ভট কথাবার্তাই খবরের কাগজের প্রথম পাতায় রাজ করল কয়েক দিন।

বেমের পরীক্ষাগুলো কিন্তু খুব সাদামাটা। একটা ডেস্কটপ কম্পিউটার ছাড়া আর কিছুই লাগে না। আমার মতো যেকোনো পিএইচডি স্টুডেন্ট চাইলেই তার পরীক্ষাগুলো নিজে নিজে করে দেখতে পারবে। বেমের আবিষ্কার সত্য না ভাঁওতা নিজেই প্রমাণ পাবে।

আমি ঠিক করলাম আমি বেমের পরীক্ষাগুলো নিজে করে দেখব। এ কাজে সাথে পেলাম আমার মতো সন্দিহান আরও দুজন মনোবিজ্ঞানীকে। বেমের

পরীক্ষার ফল নিয়ে তাদের মনেও সন্দেহ। এদের একজন হার্টফোর্ডশায়ার ইউনিভার্সিটির রিচার্ড ওয়াইজম্যান। আরেকজন গোল্ডস্মিথস ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের ক্রিস ফ্রেঞ্চ।

বেম শব্দ-তালিকার যে-পরীক্ষা করেছিলেন, আমরা ঠিক করলাম প্রথমে ওটা করব। সবাই আমরা যে যার বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবে পরীক্ষাটা চালাব। আমরা তিনবার চালালাম পরীক্ষাটা।

কয়েক সপ্তাহ বাদে আমরা গবেষণার ফল নিয়ে বসলাম। আমরা খুবই হতাশ। গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অলৌকিক কোনো ক্ষমতার ছিটেফোঁটাও পেলাম না। তার মানে, পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলো বদলায়নি।

আমরা গবেষণার ফল নিয়ে একটা গবেষণা-পত্র লিখলাম। এরপর সেটা সোজা পাঠিয়ে দিলাম *দা জার্নাল অব পার্সোনালিটি অ্যান্ড সোশাল সাইকোলজি* জার্নালে। বেমের গবেষণাটা ওখানেই ছাপা হয়েছিল।

কিন্তু কী তাজ্জব ব্যাপার—দুদিন যেতে না যেতেই আমাদের মুখের ওপর যেন দরজা ধড়াম করে বন্ধ করে দেওয়া হলো। জার্নালের সম্পাদক আমাদের গবেষণা-পত্র ফিরিয়ে দিলেন। বললেন, আমাদের গবেষণা-পত্র তাদের পত্রিকার নীতির বিরুদ্ধে যায়। তাদের নীতি হচ্ছে, আগের গবেষণা-পত্রে যে-পরীক্ষা হয়েছে, পরে যদি আবার সেসব পরীক্ষা কেউ নতুনভাবে করে গবেষণা-পত্র পাঠায়—ফলাফল যা-ই আসুক—তারা সেটা ছাপান না।

পাঠক, আপনারাই বলুন, আমাদের তখন কেমন লাগছিল!

বিজ্ঞান-পত্রিকাটি এমন একটা গবেষণা-পত্র ছাপল, যেখানে কিছু মারাত্মক দুঃসাহসী বক্তব্য এসেছে। এসব বক্তব্য সত্য হলে সেটা তো শুধু মনোবিজ্ঞানের জন্যই ইন্টারেস্টিং হতো না—বরং পুরো বিজ্ঞান জগতে নতুন হাওয়া নিয়ে আসত। এই গবেষণা-পত্রের ফলাফল জনসমুখে সগৌরবে এসেছে। গণমাধ্যমে এসেছে। 'দা কলবার্ট রিপোর্ট' নামে এক লেট-নাইট টক-শোতে বেম নিজে পর্যন্ত এসেছেন এই গবেষণার ফল নিয়ে কথা বলতে।

অথচ একই প্রক্রিয়া মেনে গবেষণা করে আগের ফলাফলকে যে-গবেষণা-পত্র প্রশ্নের মুখে ফেলল—এডিটর সেটাকে আমলেই নিলেন না। এ-ই হচ্ছে এখনকার বিজ্ঞান-চর্চার বাস্তবতা।

আজকালকার বিজ্ঞান-চর্চা যে কোথায় নেমেছে তার আরেকটা নমুনা দেখুন।

পর্ব ১

যা হবার কথা, যা হচ্ছে

১. বিজ্ঞান যেভাবে কাজ করে

আপনি ল্যাবে বসে বসে নিরিবিলি কিছু একটা পর্যবেক্ষণ করেছেন। আপনার পর্যবেক্ষণ যে বাস্তব, সেটা অন্য বিজ্ঞানীদের বোঝাতে হবে। তাদের আশ্বস্ত করতে হবে। আর এখানেই বিজ্ঞানের সামাজিক দিকটা।

গত শতাব্দীর আগে পিয়ার-রিভিউয়ের চর্চা হতো না সবখানে। পিয়ার-রিভিউ করা হবে বলে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন তো তার একটা গবেষণা-পত্রই ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। ১৯৩৬ সালে *ফিজিকাল রিভিউ* নামে এক জার্নালে তিনি একটি গবেষণা-পত্র পাঠিয়েছিলেন। পরে জানতে পারলেন ওটা নাকি অন্য এক পদার্থবিজ্ঞানীর কাছে পাঠানো হয়েছে মতামতের জন্য। তার কাছে মনে হয়েছিল এ কাজটা তার জন্য রীতিমতো মানহানিকর।

এই তো মাত্র অর্ধ-শতাব্দী আগে সত্তরের দশকে গিয়ে পিয়ার-রিভিউ একটা আনুষ্ঠানিক মাত্রা পায়।

যারা পিয়ার-রিভিউ করেন, তাদের পরিচয় সাধারণত গোপন থাকে। এটা একদিকে যেমন বর, অন্যদিকে আবার শাপ।

বর কারণ রিভিউকারেরা স্বাধীনভাবে তাদের মতামত দিতে পারেন। যার কাজ নিয়ে সমালোচনা করছেন, তার থেকে পালটা কোনো প্রতিক্রিয়ার ভয় থাকে না। একজন জুনিয়র সায়েন্টিস্ট নির্দ্বিধায় সিনিয়র সায়েন্টিস্টের কাজ নিয়ে

কথা বলতে পারেন। আবার এই একই কারণে এটা শাপ। কারণ, রিভিউকারীর মনে তো কোনো ভয় কাজ করছে না। তিনি যা ইচ্ছে তা বলে দিচ্ছেন লাগামছাড়া। নিচের কিছু পিয়ার-রিভিউয়ের মন্তব্য দেখলেই বুঝবেন এই কথাটা কেন বললাম :

—'কোনো কোনো পেপার পড়তে মজা লাগে। এটা একদমই সেরকম কিছু নয়।'

—'এই গবেষণার ফল মাকড়সার জালের মতো দুর্বল।'

—'পাণ্ডুলিপিতে তিনটা দাবি আছে। প্রথমটা আমরা অনেক বছর ধরেই জানি। দ্বিতীয়টা জানি কয়েক দশক ধরে। আর তৃতীয়টা জানি শতাব্দী ধরে।'

—'আমরা ধারণা, এই ম্যানুস্ক্রিপট এই ফিল্ডকে এগিয়ে নিতে তো কোনো অবদান রাখবেই না; বরং আরও পেছাবে।'

—'এই বাক্যটা লেখার সময় কি আপনার মৃগীরোগ হয়েছিল? কারণ, পড়ার সময় আমার হচ্ছে।'

যাক সে কথা। রিভিউকারীর মন্তব্য এমন হলে সেই গবেষণা-পত্র নির্ঘাত বাতিল। তখন আপনি হয়তো এই গবেষণা নিয়ে হাল ছেড়ে দেবেন। অথবা অন্য কোনো জার্নালে যোগাযোগ করবেন। তারাও যদি বাতিল করে, তা হলে অন্য কোনো জার্নালে যাবেন। এভাবে চলতে থাকবে। তারপর একসময় হয়তো নিম্ন-মর্যাদার কোনো জার্নাল আপনার গবেষণা-পত্র ছাপাতে রাজি হবে।

রিভিউকারীদের মন্তব্য পজিটিভ হলে আপনি আপনার কাজের সংশোধন-পরিমার্জনের সুযোগ পাবেন। হয়তো কোনো পরীক্ষা ফের নতুন করে করতে হবে। হয়তো কোনো জায়গা নতুন করে লিখতে হবে। তারপর আবার সেটা পাঠাতে হবে সম্পাদক বরাবর। সম্পাদক ফের ওটা রিভিশনের জন্য পাঠাবেন। এভাবে দেওয়া-নেওয়া চলতে থাকবে আরও কয়েক মাস।

একপর্যায়ে সব ঠিকঠাক হবে। আপনার গবেষণা-পত্র অবশেষে আলোর মুখ দেখবে।

বিজ্ঞান-পত্রটি হার্ডকপিতে বের হলে আপনি ছাপার অক্ষরে আপনার গবেষণা-পত্রটি দেখার মজা পাবেন। আর না হলে জার্নালের ওয়েবসাইটে দেখে ক্ষান্ত থাকতে হবে।

যাক—আপনার কাজ শেষ! বিজ্ঞান-সাহিত্যের জগতে আপনার নাম এসেছে। আপনি এবারে এই কাজের কথা আপনার সিভিতে দিতে পারবেন। অন্য গবেষকেরা আপনার গবেষণার উদ্ধৃতি দিতে পারবেন। আপনি এবার বাকি দিন নাকে তেল দিয়ে ঘুমোতে পারেন!

তো, মোটের ওপর কাজটা এরকমই চলে। কোথাও কমবেশি হতে পারে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই যে এত টানাহেঁচড়া হয়ে একটা গবেষণা ছাপা হলো, সেটা কি কোনো নির্ভরযোগ্য ফল দেখাল আমাদের?

২. রেপ্লিকেশন-সংকট

ধরুন, আপনি একটু পরে ইন্টারভিউ দেবেন। বা ওরকম কোনো সঙ্কটময় পরিস্থিতি। আপনি দুটো মিনিট সময় নিন। নিরিবিলি কোথাও গিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে দাঁড়ান। দুই পা দুই দিকে ছড়ানো থাকবে। হাত দুটো কোমর ধরে থাকবে। এতে আপনি মানসিকভাবে চাঙা হবেন।

২০১০ সালে কাডি আর তার সহকর্মীরা এই বিষয়ে এক গবেষণা করেছিলেন। তারা দেখেছেন, যাদের বলা হয়েছিল হাত গুটিয়ে বা সামনে ঝুঁকে বসতে, তাদের চেয়ে পাওয়ার পোজে দাঁড়ানো লোকজনের মনের জোর বেশি ছিল। জুয়া খেলায় এদের ঝুঁকি নেওয়ার সাহস বেশি হয়েছিল। এদের মধ্যে টেস্টোস্টেরন হরমোনের মাত্রা বেড়েছে। স্ট্রেস হরমোন কর্টিসলের মাত্রা কমেছে।

মাত্র দুই মিনিটের পাওয়ার পোজ আপনার জীবনকে তুমুল নাড়া দেবে—কাডির এই কথা লুফে নিয়েছিল মানুষজন। টেড টক ভিডিও দেখার তালিকায় তার ওই ভিডিওর ক্রম ছিল ২! সাত কোটিরও বেশিবার দেখা হয়েছে এই ভিডিও।

২০১৫ সালে কাডি এক বই লিখেছিলেন *প্রেজেন্স* নামে। সেটা তখন *নিউ ইয়র্ক টাইমস*-এর বেস্ট সেলার।

ঘটনা উলটে যেতে অবশ্য বেশি দিন লাগল না। সেই বছরই কাডির পরীক্ষা রেপ্লিকেট করেছিলেন একদল বিজ্ঞানী। তারা দেখেছেন, পাওয়ার পোজ করে মানুষের মনের জোর বাড়ছে বটে। কিন্তু টেস্টোস্টেরন, কর্টিসল আর ঝুঁকি নেওয়া নিয়ে যেসব কথা বলা হয়েছিল, ওগুলোর প্রমাণ মেলেনি।

মনোবিজ্ঞানের পুরোনো অনেক গবেষণা রেপ্লিকেট করেও দেখা গেছে কোনো কোনো গবেষণার ফল মিলছে না।

১৯৭১ সালে মনোবিজ্ঞানের একটা গবেষণা করেছিলেন ফিলিপ জিম্বার্ডো। সম্ভবত এটা এই শাখার সবচেয়ে বিখ্যাত গবেষণা। মনোবিদ জিম্বার্ডো কয়েকজন তরুণকে দুদলে ভাগ করে একদলকে বানিয়েছিলেন ‘পাহারাদার’, আরেকদলকে ‘বন্দি’। গবেষণার জন্য স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির বেইজমেন্টে এক নকল কারাগারে এদের ১ সপ্তাহ রাখা হবে। কিন্তু জিম্বার্ডো দেখলেন পাহারাদাররা বন্দিদের সাথে খুবই বাজে আচরণ করছে। তাদের সাথে নোংরা ব্যবহার করছে। জিম্বার্ডো বাধ্য হয়ে নির্ধারিত সময়ের আগেই পরীক্ষা শেষ করেন।

মানুষের আচার-আচরণ নিয়ে এরকম আরেকটা পরীক্ষা করেছিলেন স্টেনলি মিলগ্রাম ১৯৬০ সালে। তার পরীক্ষাটা ছিল এরকম—কিছু লোককে একটা শাস্তির কাজ তত্ত্বাবধান করতে হবে। শাস্তিটা হচ্ছে কিছু ‘শিক্ষার্থী’কে বিদ্যুতের শক দেওয়া হবে (শক আর শিক্ষার্থী দুটোই ছিল বানানো। এটা অবশ্য অংশগ্রহণকারীরা জানতেন না)।

ক্ষমতা যে মানুষের স্বভাব বদলে দিতে পারে জিম্বার্ডো আর স্ট্যানলির পরীক্ষা দুটো ছিল তার জলজ্যান্ত প্রমাণ। খারাপ পরিস্থিতিতে একজন নিতান্ত ভালো মানুষও দানব হয়ে উঠতে পারে।

স্ট্যানফোর্ড কারাগার পরীক্ষাটি মনোবিজ্ঞানের প্রায় সব অনার্স-পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের পড়ানো হয়। এই পরীক্ষার কারণে বিশ্বজোড়া খ্যাতি পেয়েছিলেন মনোবিজ্ঞানী ফিলিপ জিম্বার্ডো। ইরাকের আবু গারিব কারাগারে অনেক পাহারাদার অ্যামেরিকান সেনার বিচার হয়েছিল তাদের অপরাধের জন্য। সেই বিচারে জিম্বার্ডো ছিলেন একজন বিশেষজ্ঞ-সাক্ষী। তিনি সেখানে বলেছিলেন, এই পাহারাদার সেনারা বন্দিদের সঙ্গে যে অকথ্য দুর্ব্যবহার করেছে, নির্যাতন করেছে, সেটা তাদের দায়িত্বের ধরনের কারণেই।

স্ট্যানফোর্ড কারাগার পরীক্ষা নিয়ে সন্দেহ তো ছিলই সব সময়। তবে অতি সম্প্রতি করা একটা পরীক্ষা ওই গবেষণার বৈধতাকেই নষ্ট করে দিয়েছে।

২০১৯ সালে গবেষক ও চিত্রনির্মাতা থিবোল্ট লে টেক্সিয়ার একটা গবেষণা-পত্র ছাপিয়েছেন। তার গবেষণার শিরোনাম ছিল 'ডিবাংকিং দা স্ট্যানফোর্ড প্রিজন এক্সপেরিমেন্ট'। তার গবেষণায় একটা টেপের ট্রান্সক্রিপ্ট এসেছে। এখানে দেখা যাচ্ছে জিম্বার্ডো তার পরীক্ষা চালানোর সময় সরাসরি 'গার্ড'-দের বিশেষ নির্দেশনা দিচ্ছেন। কীভাবে কী আচরণ করতে হবে তিনি বলে দিচ্ছেন। এমনকি আচরণগুলো কেমন অমানবিক হবে তা-ও বলে দিচ্ছেন। যেমন : তিনি বলছেন, বন্দিদের যেন টয়লেটও ব্যবহার করতে না দেওয়া হয়।মানে পুরো গবেষণাটি ছিল একটা নাটক। সাধারণ মানুষেরা বিশেষ দায়িত্ব পেলে আসলেই ঠিক কী আচরণ করত তার কিছুই নেই এখানে। অথচ কত কত বছর ধরে গবেষণাটি পুরো বিশ্বে নজর কেড়ে এসেছে। কিন্তু এখন বৈজ্ঞানিকভাবে এটি পুরোই একটি নিরর্থক গবেষণা বলে প্রমাণিত।

এরকম ঘটনা একটা-দুটো ঘটেনি। প্রাইমিং গবেষণার মতো কোথাও কোথাও রেপ্লিকেশন করে ফল মেলেনি। বেমের অলৌকিক আবিষ্কারের মতো কোনো কোনো গবেষণার ফলাফল উদ্ভট। জিম্বার্ডোর পরীক্ষায় দেখলাম অপকৌশল।

স্টেপলের গবেষণার মতো অনেক গবেষণায় উপাত্ত জাল। মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন গবেষণার এমন নাজুক হাল দেখে মনোবিজ্ঞানীরা আঁতকে উঠলেন। আর কোন কোন গবেষণার এমন অবস্থা? কাদের গবেষণা তা হলে তারা বিশ্বাস করবে?

সমস্যার সমাধানে মনোবিজ্ঞানীদের অনেকে এক হলেন। তারা ঠিক করলেন বড় বড় গবেষণাগুলো তারা একাধিক গবেষণাগারে রেপ্লিকেট করবেন।

মনোবিজ্ঞানের তিনটি শীর্ষস্থানীয় জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা-পত্র থেকে তারা ১০০টা পরীক্ষা বাছাই করলেন। তারা এগুলো রেপ্লিকেট করবেন। ২০১৫ সালে তাদের এসব গবেষণার ফল প্রকাশ হলো *সায়েন্স* ম্যাগাজিনে। দুঃখের বিষয় মাত্র ৩৯% গবেষণা সফলভাবে রেপ্লিকেট করা গেছে।

২০১৮ সালে এরকম চেষ্টা হয়েছে আরও একবার। এবার গবেষণা-পত্র নেওয়া হয়েছে দুনিয়ার সবচেয়ে প্রভাবশালী দুই সাময়িকী *নেচার* আর *সায়েন্স* থেকে। সমাজ-বিজ্ঞানের ওপর-করা ২১টি গবেষণা রেপ্লিকেট করে দেখা গেছে সফলতার হার ৬২%। এগুলোর ওপর আরও রেপ্লিকেশন করে দেখা গেছে সফলতার হার ৭৭%, ৫৪%, ৩৮%। যেগুলোর রেপ্লিকেশন সফল হয়েছিল, সেসবের বেলায় আবার দেখা গেছে মূল গবেষণায় ফলাফলের প্রভাব নিয়ে অতিরঞ্জন হয়েছে।

মোদ্দা কথা, রেপ্লিকেশনের সংকট যেন এক ধাক্কায় মনোবিজ্ঞানের প্রায় অর্ধেক গবেষণাকে বাতিল করে দিয়েছে।

***

বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিয়ে এত অনিশ্চয়তার মধ্যে কেন আছি আমরা?

পূর্বাভাসে আমি বলেছি, গায়ে পড়ে রেপ্লিকেশন স্টাডি সাধারণত কেউ করেন না। অর্থনীতিতে মাত্র ০.১% গবেষণা রেপ্লিকেট করার চেষ্টা হয়েছে। মনোবিজ্ঞানের বেলায় অবশ্য একটু ভালো; কিন্তু সেটাও মাত্র ১%। সবাই